Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 177-185
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা – মননের বৈচিত্র্যে

অনিন্দিতা মুখার্জী
দর্শন বিভাগ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The word 'History' commonly means 'what was in the past.' Whatever is past, of course, forms history. We cannot have either present or future without the past, without history. To Tagore, history was never a collection of dry facts, an objectified truth. He has even personified history and converted the 'Kalpurusha' of history into the 'Byaktipurusha.' In his poem 'Past', he has conceived of history as always active and working silently across the globe. It is beyond doubt that the concept of History of someone who can think of history in such a dynamic and active way would be very interesting to re-examine at a time when academia is engaged in debates over the nature, character and role of history in human civilization.

Tagore's engagement with history is important since it reflected a colonized nation's negotiations with the Western project of 'Enlightenment' marked by logic and science. In the nineteenth century, our entire nation was trying to create a history of its own, which was rooted in the Indian soil and different in character from the history written by piling up facts about foreign Kings and Queens. Writing history, that too, in the mother tongue, then, was itself a part of the nation formation.

History, however, is only one small component in the oeuvre of Tagore's literature. This paper will not try to prove that Tagore was a historian. It will, rather, by examining his thoughts on history as reflected in his essays, fictions, and poems will try to show how to Tagore history was not limited to place, person and time. It will try to argue that Tagore conceived of history as a continuum, as a collective whole, inseparable from the lives lived by the common people, from their happiness and misery, ethics and religion. Tagore's concept of history, it will further claim, was, indeed, marked by his understanding of society, philosophy, literature and folk-life.

কথামুখ: ইতিহাস শব্দের সাধারন অর্থ "এই রূপই ছিল" অর্থাৎ যা কিছু অতীত তাই হল ইতিহাস। অতীতকে বাদ দিয়ে কখনই বর্তমান বা ভবিষ্যতের গমনাগমন সম্ভব নয় । অতীতকে ধরেই তার ভবিষ্যতের ব্যূহ রচনা হয় । এই অতীতই ইতিহাস । বেদব্যাস মহাভারতের শুরুতেই ইতিহাসের এই প্রামাণিকতা স্বীকার করেছেন – 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিহিতাসংপুরাতনম' –(মহাভারত)[১]। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের কালপুরুষকে সাহিত্যের ব্যক্তিপুরুষে রূপান্তরিত করেছেন । তিনি এই ইতিহাসকে বলেছেনঃ –

"হে অতীত, তুমি গোপনে গোপনে,
কাজ করে যাও ভুবনে ভুবনে,..."[২]

যিনি ইতিহাস কে এইভাবে সক্ষম, কর্মচঞ্চল রুপে অনুভব করেন, তাঁর চেতনায় ইতিহাস যে নব নব রূপ ধারণ করবে তা বলাই বাহুল্য । বিপুল ও বিশাল রবীন্দ্র সাহিত্য ও রচনার মধ্যে ইতিহাস চিন্তা একটি দিক মাত্র । উনিশ শতকে বিদেশী শাসকদের প্রভাব ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কারণে বাঙ্গালী মননে স্থান পেয়েছিল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতা। এই পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যেও বাঙ্গালী হারিয়ে ফেলেনি তার ইতিহাস চেতনা ।জাতির ইতিহাস চেতনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নিজের অস্তিত্বের মূলকে আবিষ্কার করার নেশা । এই ইতিহাস শুধুই নিজ জাতির, নিজ দেশের ইতিহাস । বিদেশী রাজরাজড়ার কীর্তি-কাহিনীর মর্মর সৌধ স্থাপত্যের ইতিহাস নয়। উনিশশতকে নবজাগরণের অন্যতম লক্ষণ হল এই ইতিহাস চেতনা । মাতৃভাষায় স্বদেশের ইতিহাস কে দেশের সামনে তুলে ধরার প্রক্রিয়া এই সময় বাঙ্গালীকে করেছিল গৌরবান্বিত ।

আলোচ্য বিষয়ের মুখ্য প্রতি পাদ্য হল:
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা, তার অগাধ মননের বৈচিত্র্যে । রবীন্দ্রনাথ কি যথার্থ ঐতিহাসিক ছিলেন, নাকি ছিলেন না - এই প্রশ্ন অবান্তব। আসলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে "এই ভারতের মহা মানবের" ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায়না । নিছক স্থান-কাল-সন-তারিখের গণ্ডিতে তিনি ইতিহাসকে আবদ্ধ করে রাখেননি । তাঁর ইতিহাস চিন্তা কখনো প্রবন্ধে, কখনো সৃজনশীল সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পদ্যে, গদ্যে, গীতিতে তাঁর ইতিহাস চিন্তা সাধারন মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-ধর্ম ও ভাঙ্গা-গড়ার কাহিনীর প্রতিফলন ঘটিয়েছে । তাই রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা কখনই সমাজ, দর্শন, সাহিত্য ও লোকজীবন থেকে বিছিন্ন নয়।
কথারম্ভ:

> "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দেই তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র । ... পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে । ... ঘরের কথা কিছু মাত্র পাইনা । সেই ইতিহাস পড়লেই মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিলনা, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুখর বার্তাবর্ত শুষ্ক পত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল ।
> ...তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবন স্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টা তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ প্রধানত : কবি রূপে হলেও সাহিত্য ও মননের সকল ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ । ভারতবর্ষের সার্থকতার উত্তর তিনি খুঁজেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে। তাঁর ইতিহাস চিন্তা কয়েকটি প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ নয় । আসলে তাঁর চেতনায়, বিশ্বাসে, আদর্শে ইতিহাস বোধ গভীর ভাবেই ছিল বলেই, উনিশ শতকে বাঙালী মনীষার তালিকায় ইতিহাস চিন্তার অন্যতম নায়ক হিসাবে তাঁকে স্বীকার করতেই হয় । ঠিক এই কারণেই আজ রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর ইতিহাস চিন্তা আলোচনার বিষয় হিসাবে প্রবেশাধিকার পেয়েছে । এই প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা যেমন গুরুত্ব লাভ করেছে তেমনই তাঁর চেতনায় যা উহ্য রয়ে গেছে সেই না বলা কথা সমাজ ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর নিগূঢ় চিন্তা ভাবনার প্রতি আমাদের আজকের মন অনুসন্ধিৎসু হচ্ছে ।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা পাই । প্রথমতঃ তিনি সন তারিখের থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের কর্ম-কৃতিত্বকে । দ্বিতীয়তঃ মানুষের কৃতিত্বের বিচারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ইতিহাসে বংশ বা স্থান কে গুরুত্ব দেননি । তাই তাঁর ইতিহাস ভাবনায় সেই সমস্ত মানুষের জীবনচরিত উঠে

এসেছে যারা তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েও মানব সমাজের কল্যাণ কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ ইতিহাস ভাবনায় ঐতিহাসিক ঘটনার থেকেও বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঘটনার সাথে জড়িত চরিত্রগুলোকে। সেইজন্য তার ইতিহাস ভাবনায় তিনি শিরোনামে আলোকপাত করেছেন কোন একজন ব্যক্তি বা জাতিকে । চতুর্থতঃ রবীন্দ্র চিন্তায় স্বদেশ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে । তাঁর ইতিহাস ভাবনায় আমরা দেখি যে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন যে, যে সমস্ত মানুষের কৃতিত্ব সকলের কাছে, সর্বস্তরে পৌঁছয়নি তাদের কথাই তিনি তাঁর ইতিহাস ভাবনায় বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন-

> "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথ কে একই লক্ষের অভিমুখীন করে দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা। বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাকে নষ্ট না করিয়া তার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস: সে যুগের 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'শান্তিনিকেতন', 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইতিহাস চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাস ভাবনায় সংহতির উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন । ভারত ইতিহাসের মূলসুত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাই কবি ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ও ধারা কিভাবে প্রবাহিত হয়েছে তা আলোচনা করেছেন । এই প্রসঙ্গেই কবি আর্য-অনার্যদের সম্পর্কের মধ্যে ঐক্যের সূত্র অনুসন্ধান করেছেন । ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের আর্য-অনার্য এই দুই ধারার মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন রচিত হয়েছে সেই পুরাণের কাল থেকে। রামায়ণে রামচন্দ্র অনার্যদের জয় করেছেন ভক্তির দ্বারা, অপরদিকে মহাভারত আলোচনা করলে দেখা যায় আর্য-অনার্যের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটেছে । এই মহামিলনের মাধ্যমেই উপলব্ধ হয় ভারতবর্ষের ঐক্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন, যা ভারতের কেবলমাত্র ভারতের নিজস্ব ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে । ভারতের ইতিহাস হল সত্য, সাধনা ও প্রেমের ইতিহাস । কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ তাই ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্যসাধনকেই উপলব্ধি করেছেন ।

গীতাঞ্জলির 'ভারততীর্থ' কবিতাটি এই পর্যায়ের । প্রথম প্রকাশের সময় 'ভারততীর্থে'র নাম ছিল 'মাতৃ অভিষেক' । ভারতবর্ষ কবির মতে 'পুণ্যতীর্থ' ।আর ভারতের মানুষ তাঁর কাছে 'নরদেবতা'। কবি তাঁর ভাব কল্পনার ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ 'দেশ বলতে কেবলতো মাটীর দেশ নয় । সে যে মানব চরিত্রের দেশ । দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানব চরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে।' তাই ভারতবর্ষ মহা মানবের সাগরতীর ।'ভারততীর্থ' কবিতার শেষ স্তবকে তাই উদার উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে–

" এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান –
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার ।
এসো হে পতিত, হোক অপোনীত সব অপমাণভার ।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে-
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"[৫]

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তার অন্যতম দিক হল তুলনামূলক ইতিহাস চিন্তা, ভারত-ইতিহাসের সাথে বিশ্ব-ইতিহাসও কবির চেতনাকে ছুঁয়ে গেছে । ভারতবোধ এখানে উন্নীত হয়েছে বিশ্ব-চেতনায় । কৈশোর থেকে ইউরোপীয় জীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে তাঁর ভাবনা শুরু হয়েছিল । পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের কারণে তিনি সেইসব দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন । এইসব দেশের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় । সে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা বুয়র দেশ আক্রমণ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলো । চীন দেশের ওপর আক্রমণ ও লাঞ্ছনা চলেছিল । এই ঘটনার অভিঘাতে নৈবেদ্যর এই কবিতা – ‘ শতাব্দীর সূর্য আজি রক্ত মেঘ মাঝে অস্ত গেল।’

রবীন্দ্র মননে ইতিহাস ও সমাজ :

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস হল ঘরের তথা সমাজের ইতিহাস । বিদেশী পথিকের ন্যায় ধূলি-ঝড়ের বা মৃত মানুষের ইতিহাস নয়, । তাঁর কাছে ইতিহাস সিংহাসন, মসনদ, তাজ, তরবারির ইতিহাস নয়, এই ইতিহাস হল পদ্যে, গদ্যে, সাহিত্যে সমাজকে অনুভব করা, সমাজকে দেখা । তাই সন-তারিখের বর্ণনা ছাড়াই মানুষের জীবন দর্শন ফুটে উঠেছে তাঁর ইতিহাস ভাবনায় । রবীন্দ্র রচনায় যে ইতিহাস ও সমাজ দর্শনের মিশেল আছে তা সাধারণ ঐতিহাসিকদের রচনায় পাওয়া যায় না । তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ তাদের রচনায় নিরপেক্ষ মতামত দেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিহাস রচনায় চরিত্রের সাথে মিশে কখনো সেই চরিত্রকে তিরস্কার করেন আবার কখনো কোন চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে কুণ্ঠা করেননা । তাই তাঁর ইতিহাস ভাবনা শুধুমাত্র তথ্য ও সময়ের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যায়নি । নিছক ইতিহাস বইয়ের থেকে আরও সমৃদ্ধ রূপে প্রতিফলিত হয়েছে মানব জীবনের সমাজদর্শন । যা সাধারণ ইতিহাস রচনায় মেলেনা। তাঁর ভারত বোধে তাই সমস্ত মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাদৃত ।

রবীন্দ্রনাথ যে সময় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন, সে সময় খুব কম বাঙালী লেখকই ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেছেন । সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সেটি নিয়ে তাঁর জীবনের প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেন । সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে বাংলায় রচিত সেটিই প্রথম প্রবন্ধ। রোম্যান্টিক কবি বলে খ্যাত রবীন্দ্রনাথকে কিশোর বয়সেই ইতিহাস উদ্বুদ্ধ করেছিল লেখনী ধরতে । রবীন্দ্রসাহিত্যে ‘পুরাণ’ তাঁর ইতিহাস চেতনার আর একটি দিক । মহাভারতের কাহিনী নিয়ে ‘গান্ধারীর আবেদন’ এবং ‘কর্ণ কুন্তী সংবাদ’ – এই দুটি নাট্য কবিতাই সে যুগের সামাজিক ঘেরাটোপ, উপেক্ষা, আদর্শ ও নৈতিকতার জয়গাঁথা । ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ঝাঁসির রানী’ প্রবন্ধ তাঁর ইতিহাস চর্চার অন্যতম দিক । এই প্রবন্ধে তিনি এক বিধবা, রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রানীর যে বিরত্বের কাহিনী তুলে ধরেছেন তাতে শ্রদ্ধায় রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রতি মাথা নত হয়ে আসে । এই কাহিনী নিছক ইতিহাসের শাণিত তরবারির ঝনঝন আওয়াজ বা কাটাকাটি – মারামারির কাহিনী নয়। এই কাহিনী বহু সামাজিক প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে এক বীরাঙ্গনা নারীর সম্ভ্রম রক্ষার কাহিনী, সমাজের কাহিনী ।

কবি রূপে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তিনি কখনই দেশের সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না । ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁর সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত । ফলে পরাধীন ভারতে যখনই ইতিহাসের ঐক্য লঙ্ঘিত হয়েছে তখনই তিনি সরব হয়েছেন । তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সম্প্রীতির উৎসব রাখী বন্ধন পালন । বাংলার প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে তখন ফিরেছে ঐক্য বন্ধনের মহামন্ত্র –

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক হে ভগবান ।”[৬]

শুধু এই নয়, পরবর্তীকালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ তাঁর সমাজ-ইতিহাস, রাজনীতি সম্প্রীক্তির উজ্বল নিদর্শন । তিনি জাতীয়তাবাদী হলেও উগ্রজাতীয়তাবাদকে কখনো প্রশ্রয় দেননি । মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সহিংস নীতি – উভয় পক্ষেই তাঁর সমর্থন ছিল । কিন্তু কোনটিতেই তিনি পূর্ণ সমর্থন করেননি । এগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি সর্বজন স্বীকৃত পথকে তিনি অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন । পরবর্তী কালে তিনি 'কালান্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গি গুলি প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতি-চিন্তার সম্মিলিত বাঙময় প্রকাশ । 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধের মধ্যে তিনি যে সঙ্কটের কথা বলে গেছেন তা প্রকৃত পক্ষে একজন যুক্তিনিষ্ঠ, মননশীল, সমাজ ইতিহাসবেত্তার সুচিন্তিত অভিজ্ঞতার প্রকাশ । ফলে, কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাববাদী চেতনার গভীরে সমাজের ইতিহাসের উত্থান পতনের যে ধারাবাহিকতার প্রমোত্তরণটিকে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর সহজাত প্রজ্ঞায়, বিশিষ্টতায় – একথা অনস্বীকার্য ।

রবীন্দ্র মননে ইতিহাস ও দর্শন:

ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি হল অদ্বৈত দর্শন । শংকরাচার্যের 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' –এই মতকে সর্বতোগামী না করার জন্যই রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক প্রমুখ পরবর্তী কালে দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এর প্রবর্তন করলেও আচার্য রামানুজের দ্বৈতবাদই পরবর্তী কালে আরও পরিশীলিত হয়ে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের অনুপ্রেরণায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে পরিণত হয় । রবীন্দ্রনাথ সাধারণ দৃষ্টিতে ভাববাদী । কিন্তু তাঁর এই ভাব দর্শনের মধ্যে ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদের সাথে দ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সবকিছু জারিত হয়ে এক বিশেষ 'রাবীন্দ্রিক ভাব'-এ রূপায়িত হয়েছিল । তিনি লীলাবাদী । পাশ্চাত্যের 'প্লে-থিওরি' তিনি মানলেও এই খেলার বিপুলতাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন লীলায় । তাঁর ভাবনায় ঠিক মত 'হয়ে ওঠা'-টাই সত্য । 'তথ্য' ও 'সত্যে'র নিরিখে 'সত্য' প্রতিষ্ঠায় তিনি লীলাবাদী । তাই তিনি অনায়াসে বলতে পারেন –

" আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরান সখা বন্ধু হে আমার ।।" [৭]
অথবা
"তাই তোমার আনন্দ আমার'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে-
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।।"[৮]

উপনিষদের 'রসো বৈ সঃ' – যিনি, তাঁকে আবির্ভূত হতে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জন্য। এই ভাবনা কোন ভাববাদী দর্শনই স্বীকার করেনি । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননের প্রগারতায় বিশ্ব স্রষ্টাকে তাঁর লীলার সঙ্গী বলে মনে করে যেমন গর্বিত হয়েছেন আবার অপর দিকে তাঁরই চরণ তলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে পূর্ণ হতে চেয়েছেন-

"চরণ ধরিতে দিওগো আমারে,
নিওনা, নিওনা সরায়ে ।" [৯]

রবীন্দ্র দর্শন হল মানবতাবাদী দর্শন বা মানবমুখী দর্শন । আমরা দর্শনের যে বিভিন্ন দিক পেয়েছি সেদিক থেকে বিচার করলে তাঁর দর্শন ভাববাদী দর্শন । তিনি তাঁর দর্শন ভাবনায় মানুষ ও তার কৃতিত্ব কে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই দর্শন সর্বদা কল্যাণমুখী দর্শন । যেখানে তিনি মানুষ ও সমাজের কল্যাণকেই গুরুত্ব দিয়েছেন । এমনকি তাঁর সৌন্দর্য দর্শনে তিনি বিনোদনের থেকে

বেশী শৃঙ্খলাবোধ, সংযম ও কল্যাণকে মান্যতা দিয়েছেন । ভারতীয় দর্শনের ধারাকে তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাকে নির্বিবাদে গ্রহন করেননি । ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস তাঁর ভাবসত্তায় জারিত হয়ে রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। ইতিহাস সবকিছুর মধ্যেই আছে, তাকে বিশেষ ভাবে অনুভব করে সেই ধারার নতুন খাত তৈরি ইতিহাসবিদ-এর উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এই অনুভবকেই মর্যাদা দিয়েছেন ।সবসময় খুব সচেতনচভাবে এই দার্শনিক প্রত্যয়কে তিনি যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তা নয়; তাঁর চিন্তনের প্রগাঢ়তায় এই বোধ নিজেই তার জায়গা করে নিয়েছে । এখানে ইতিহাস তার বস্তু সত্যে নেই, আছে ভাব সত্যে ।

রবীন্দ্র দর্শন তাঁর ইতিহাস চর্চায় নানা ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । 'গীতাঞ্জলির' বিভিন্ন কবিতায় স্বদেশ ও সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনার ইতিহাস জড়িয়ে আছে । দেশের এই ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার জীবন দর্শন । কবি লিখেছেন :

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।
মানুষের অধিকারে,
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।" [১০]

বাঁচার মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য সোচ্চার কবির লেখনী ।মানব প্রেমের পথে তিনি মার্ক্স, লেনিন, গান্ধী, বিবেকানন্দের সহযাত্রী । তাঁর এই মানবতাবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতের ইতিহাস চিন্তায় এক সমন্বয়ধর্মী বিশিষ্ট সমাজের ছবি ফুটে ওঠে । যার প্রকাশ ঘটে 'ভারততীর্থ' কবিতায় ঐক্যবোধের সুমহান আদর্শে । 'সর্বজনীন জীবনের ঐক্যতান' ই 'ভারতের ভাবগত ইতিহাসের মুলমন্ত্র'। তৎকালীন ভারতের ইতিহাস ছিল হিন্দু মুসলিমের সাম্প্রদায়িক সমস্যা, অস্পৃশ্যতার লাঞ্ছনা, বিপ্লবী সন্ত্রাসের কালিমা লিপ্ত । যার দ্বারা ভারতের ভাবগত ইতিহাস হয়েছে কলুষিত । এই কলুষতা ঘোচানোর জন্য কল্যাণবাদী দার্শনিক কবির লেখনীতে সাম্যবাদের গান ধ্বনিত হয়েছে । সকল সঙ্কীর্ণতা, দীনতা কূপমন্ডুকতাকে দূর করে বিশ্বমৈত্রী স্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য । তাঁর ভারত বোধের সাথে যে ভাবে ভারতের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা তাঁর জীবন দর্শনেরই অভিব্যাক্তি মাত্র ।

রবীন্দ্র মননে ইতিহাস ও সাহিত্য:

বাংলা নবজাগরনের প্রথমপর্বে বাংলা তথা ভারতীর উপন্যাসকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন যে ত্রয়ী তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম । মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ কাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস লীলার প্রথম অধ্যায়ের সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আমার পাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি উপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি কোন খাতির নাই। ...কিন্তু সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হটাৎ পাঠকদের মাথায় যেন বাড়ি পরে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।"[১১]

তাই রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসটি সে যুগের বারো ভুঁইঞা সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার সমাজ ব্যবস্থা কে তুলে ধরলেও অধিকাংশ পাঠক মনে করেন এই উপন্যাস ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক নয়। প্রতাপ চরিত্রটি বরং লেখকের দৃষ্টি অনুগত একটি অনৈতিহাসিক বিকৃত প্রাণী । সমালোচকদের এই বক্তব্যকে স্বীকার করেও বলা চলে যে, এখানে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বলতে বসেননি;

ফলে চরিত্র এবং ঘটনার বর্ণনায়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যস্থতাই যে ইতিহাসটুকু প্রাসঙ্গিক ছিল সেটুকুকেই তিনি স্থান দিতে চেয়েছিলেন ।

'গোরা' রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যোপম উপন্যাস । ফলে এর বিশালতা, গভীরতা, বিস্তার, ভাবনা, বৈচিত্র, আঙ্গিক – সমস্ত কিছুই বৈচিত্রমণ্ডিত । গোরার নামধর্মী তথা চরিত্র কেন্দ্রিক এই নামকরণ, চরিত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর চিন্তা ভাবনা ভরকেন্দ্র অনুযায়ী আবর্তিত হয়েছে । হিন্দু-ব্রাহ্মের বিরোধ জাতীয় উনিশ শতকীয় ইতিহাসের এক বিশেষ প্রেক্ষিতে উপন্যাসটি স্থাপিত। ধর্মকে ইতিহাসের সাথে মিশিয়ে এক বৃহৎ বলয় দিয়েছেন তিনি। যার সূচনা 'গোরা'-য় তথাকথিত হিন্দু ধর্ম নিয়ে প্রাবল্যের মাধ্যমে। এই উপন্যাসে গোরার সংগ্রাম বৃহত্তর আদর্শমুখী, দেশ-কালের সুবিস্তৃত সীমানা পর্যন্ত তার বিস্তার । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নিজের জন্ম রহস্য প্রকাশ হয়ে সে যখন অহিন্দু প্রমাণিত হয় তখন তার রক্ষণশীলতার কবচ গুঁড়িয়ে গিয়ে আনন্দময়ীকে বলা তার নিজের কথাটাই সত্য হয়ে ওঠে – 'মা তুমি আমার ভারতবর্ষ' – অর্থাৎ রক্ষণশীলতায়, অস্পৃশ্যতায়, জাতপাতের বিভেদের ইতিহাস তার নিজ চেতনাকে গন্ডীবদ্ধ রাখেনা কোনোদিন । সে প্রবাহিত হয় তার নিজস্ব ধারায়, মহামানবের সাগর তীরে যার মহা মিলন ক্ষেত্র ।

আবার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিলিতি জিনিস পুড়িয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে উজ্জীবিত করেছেন কবি । এই বিশ্ববন্দিত ধ্বনিটি আসলে ছিল একটি নেতিবাচক ধ্বংসাত্মক যজ্ঞের মন্ত্র বিশেষ । এই উপন্যাসেই আমরা পাই 'Terrorism' যার অর্থ সন্ত্রাসবাদ । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিভীষিকাপন্থী' । অমূল্য এই পন্থাকে বহন করে নিয়ে আসে উপন্যাসের মুলস্রোতে । অমুল্য ও সন্দীপের স্বাদেশিকতার পার্থক্যকে বোঝাতে গিয়ে লেখক এখানে উগ্রস্বদেশীবাদ ও বিপ্লবীদের কর্মপন্থার সমালোচনা করেছেন । এখানে তিনি হিন্দু বাঙালী স্বদেশী নেতা সন্দীপের মাধ্যমে দুর্গা, জগদ্ধাত্রী পুজাকে প্রবঞ্চনার অস্ত্র হিসাবে দেখান । কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যে চারিত্রিক নিষ্ঠা ছিল, সেই আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে 'সন্দীপ' চরিত্রটি পাঠকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ইতিহাস এখানে মিশে যায় মানুষের চারিত্রিক উন্নতি ও অবনতির পরাকাষ্ঠার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের অপর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চার অধ্যায়'-এ একই রকম কপটচারী, বিভীষিকাবাদী কর্মী ও স্বার্থপ্রণোদিত নষ্ট চরিত্র নায়কদের বর্ণনা । আঠারো বছরের ব্যবধান এ তাঁর দুটি রাজনৈতিক উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়'। প্রথমটি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ঘটনার সময়ের স্বদেশী আন্দোলনের ধারা বহন করছে । দ্বিতীয়টি পরবর্তী কালে অগ্নি যুগের সহিংস ও বিপ্লবধর্মী কার্যকলাপ নিয়ে । 'চার অধ্যায়'-এ বর্ণিত হয়েছে ব্যর্থ প্রেমিক অতিনের জবানিতে সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যকলাপের কলঙ্কময় প্রতিচিত্র । যার পেছনে কোন প্রমাণ মুলক ঘটনা বিন্যাস নেই । কিন্তু বিভিন্ন সমালোচনার মধ্যে খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না সেই সময়ের ইতিহাসের ধারাকে ।

'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একের পর এক ইতিহাসের ছোট ছোট গল্পগুলি হল 'কাজের লোক কে' , 'গুটিকত গল্প', 'আকবর শাহের উদারতা', 'ন্যায় ধর্ম', 'বীরগুরু', ও 'শিখ স্বাধীনতা' । এই গল্পগুলি ইতিহাসের গল্প হলেও এইগুলি কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস কে ছাপিয়ে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় প্রবাহিত ।এই গল্পগুলি শুধুমাত্র তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর নয়, এতে আছে অনুভুতি, দার্শনিক ভাবনা ও রসের মেলবন্ধন । একদিকে সাধারণ বেচা-কেনা ও অন্যদিকে ধর্মীয় ভাবধারার আদান প্রদান, এই দুইয়ের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তা অতি সুন্দর করে বলা আছে 'কাজের লোক কে'-এই গল্পটির মধ্যে । এই ছোট ছোট গল্পগুলির মধ্যে আমরা পাই শিখ জাতির অভ্যুত্থানের গল্প, বহু অনুকুল পরিবেশে মানুষের সমাজে টিকে থাকার গল্প, মানুষের গল্প, দেশাত্মবোধের গল্প । ঘোরতর দুর্যোগের অন্ধকারে বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নত না করা ঐ রাজপুত, শিখ বা মারাঠার ইতিহাস হল ভারতের নিজস্ব

ইতিহাস । এই ইতিহাসের মাধম্যেই ভারতবর্ষ অনুভব করেছে ঐক্যের সত্যকে, স্বজাত্যবোধের মুল্যকে । নিজত্বকে ছেড়ে সর্বত্বকে পাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে আছে তা ভারতের ইতিহাসের প্রবহমান ধারার মধ্যে কবি আমাদের উপলব্ধি করিয়েছেন 'বন্দীবীর', 'হোরিখেলা' প্রভৃতি কবিতায় । তাঁর ইতিহাসচর্চা নিছক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ নয়। এর চর্চা তাঁর ঐক্যবদ্ধ সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গিরও পরিচায়ক ।'শিবাজি উৎসব' কবিতায় যেমন কবি স্বপ্ন দেখেছেন অখণ্ড ভারতের, আবার 'শাহাজাহান' কবিতার ইতিহাস কবির মননে তার নিজস্বতাকে প্রকাশ করেছেন । আবার তেমনই ঐ ইতিহাসের অভ্যন্তরে তিনি শাহজাহানের চিরন্তন ভালবাসাটিকে ফুটে উঠিতে দেখছেন । পাশ্চাত্য নন্দন তাত্ত্বিকদের "art for art sake" ধারনাকেই তিনি মূর্ত করে তুলেছেন –

"কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল,
এ তাজমহল।" [১২]

এখানে দেশাত্মবোধ ও নৈব্যাক্তিক নিঃস্বার্থ চেতনাই সক্রিয় থেকেছে ।

কথা সমাপন:

আজীবন ভুমানন্দের উপাসক রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকেও দেখেছেন এই ভূমার দৃষ্টিতেই । তাঁর বৈচিত্র্যময় মননধর্মীতায়, ইতিহাসের ব্যাপ্তি তাঁর নিজস্ব চেতনাকে যেমন প্রকাশ করেছে অনবদ্যতায়, আবার তেমনি কবিত্বময়তায় সে নিজেই হয়ে উঠেছে এক অন্যতর সত্তা । ফলে তাঁর সামগ্রিক জীবনে বহু ব্যাপ্তিতে ইতিহাস ভাবনা বহুতর আঙ্গিকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে । শুধু সাহিত্যজীবনই নয়; রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যাক্তি স্বত্বায় জমিদার হিসাবে মহাল পরিদর্শনের কাজে যখনই গেছেন তখন তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত সাধারণ মানুষের জীবন ইতিহাস, যা কালচক্রে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান । সেই ইতিহাসের ছাপ আমার পাই 'সমাপ্তি', 'ছুটি', 'পোস্ট মাস্টার' প্রভৃতি গল্পে । মানুষের এই দীর্ঘায়িত জীবন-ইতিহাস তাকে প্রতি মুহূর্তে ভাবিয়েছে । এই ইতিহাস কে তিনি মিশিয়ে দিয়াছেন তাঁর সাহিত্য-মন্দাকিনীর অজস্রধারায় । তাঁর কাছে ইতিহাস তাই কেবল ধ্বংসস্তূপ নয়, বরং তাঁর প্রাণসত্তার সঞ্জীবনী ধারা।

তথ্যঋণ:

১. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য
২. 'কথা কও, কথা কও', কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ
৩. ইতিহাস – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', বিশ্বভারতী
৪. ঐ
৫. ভারততীর্থ
৬. গীতবিতান ও বিবিধ কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ ৪র্থ খণ্ড
৭. পূজা, ৯৫, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড
৮. পূজা, ২৯৪, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড
৯. শ্যামা নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড
১০. গীতাঞ্জলী-'অপমানিত'-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১. ঐতিহাসিক উপন্যাস- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২. শা-জাহান, বলাকা, সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থঋণ:

১৩. ভারত পথিক রাম মোহন রায়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী
১৪. জীবন স্মৃতি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বাদেশিকতা, বিশ্বভারতী

১৫. কালান্তর - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী
১৬. ঐ – বৃহত্তর ভারত, তদেব
১৭. গীতবিতান - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী
১৮. স্বদেশ – 'সমাজভেদ', রবীন্দ্র রচনাবলী ১১ ।
১৯. চিঠিপত্র - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী
২০. ভারতবর্ষ – 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' - রবীন্দ্র রচনাবলী ৪র্থ
২১. রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২য় খণ্ড
২২. উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩. রবীন্দ্র মনন, নন্দ দুলাল বনিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
২৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, প ব সরকার